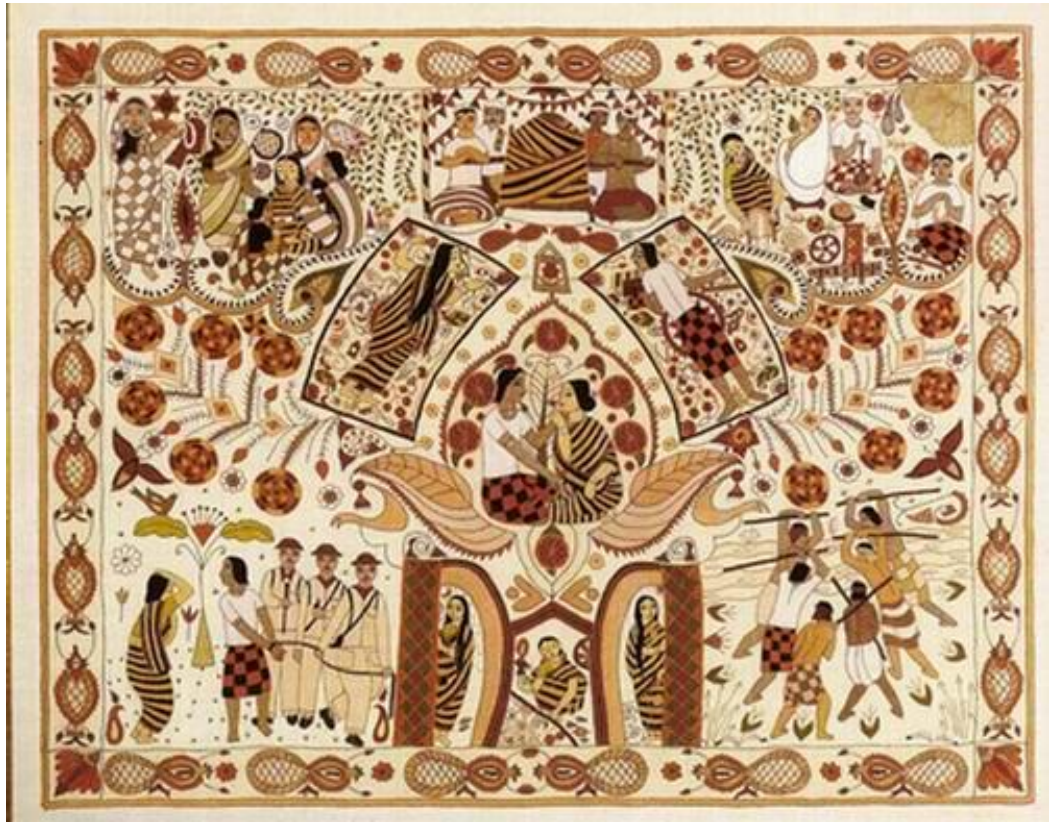

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

P2A

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

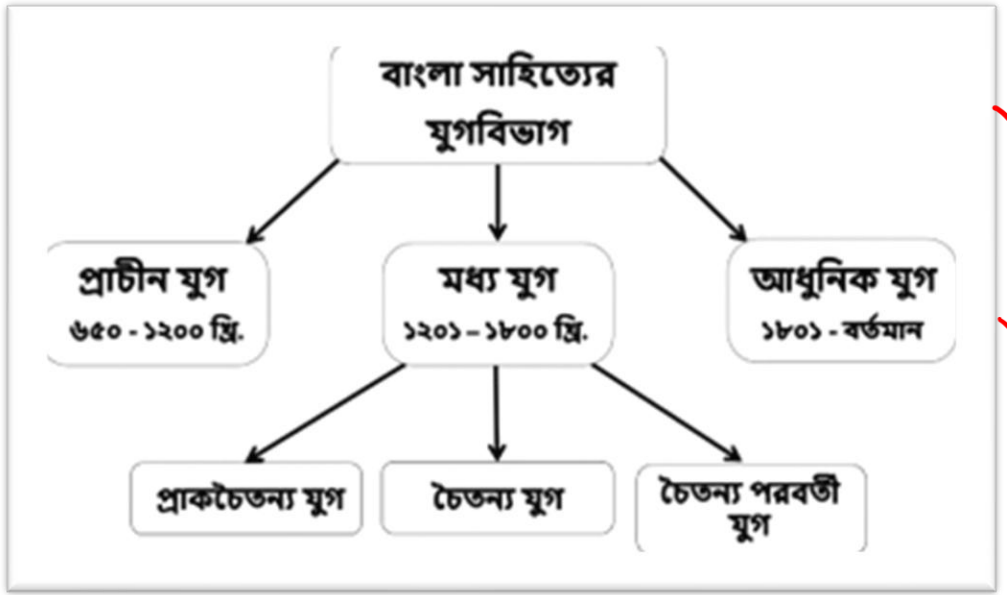

- প্রাচীন যুগ : ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- মধ্যযুগ: ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আধুনিক যুগ : ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল।

মধ্যযুগ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক।

ধর্মীয় আবেশে মধ্যযুগে সাহিত্য রচনা হত।

অন্ধকার যুগ (১২০১- ১৩৫০)

১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ- এই ১৫০ বছরকে কেউ কেউ **‘অন্ধকার যুগ’** বলে চিহ্নিত করেন।

অনুমান করা হয়, তুর্কি বিজয়ের ফলে মুসলিম শাসনামলের সূচনার পটভূমিতে নানা অস্থিরতার কারণে এ সময় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি।

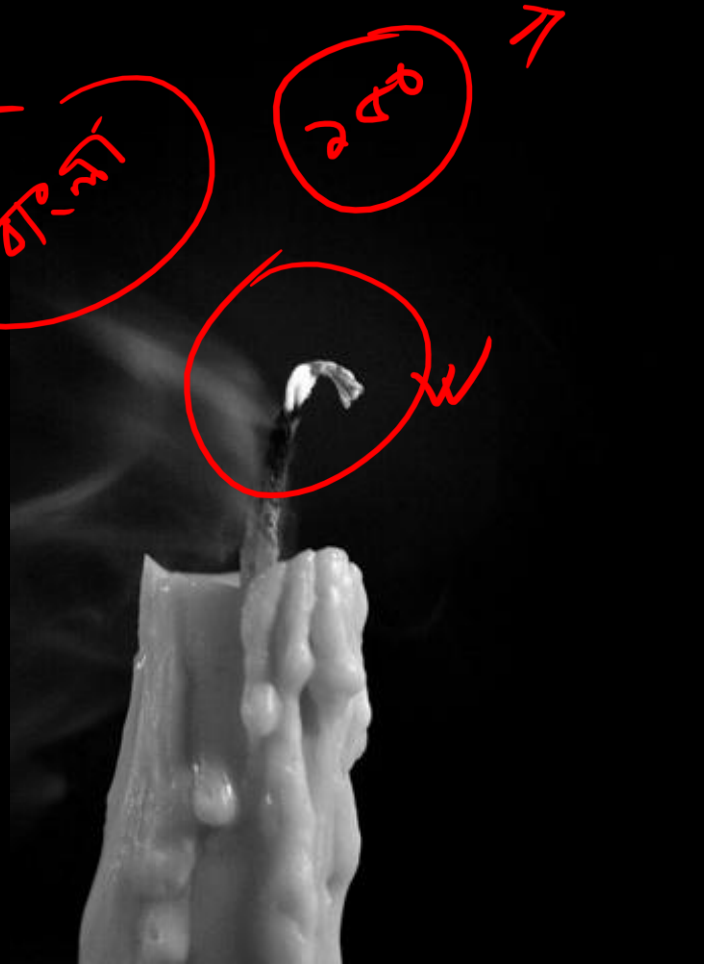

অন্ধকার যুগ

(১২০১- ১৩৫০)

এ যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন হলো-

শূন্যপূরাণ

সেকশুভোদয়া

খনার বচন

শূন্যপূরাণ/ সেক শুভোদয়া

- রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'।
- শূন্যপুরাণ **গদ্য ও পদ্যের** মিশ্রণে রচিত একটি চম্পূকাব্য।
- রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি **হলায়ুধ মিশ্র** রচিত 'সেক শুভোদয়া' সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য।
- গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
- এ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার যে সব নিদর্শন আছে তা হল- **পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা ছড়া বা আর্যা, খনার বচন ও ভাটিয়ালি রাগের একটি প্রেমসঙ্গীত।**

সেক শুভোদয়া

- রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি **হলায়ুধ মিশ্র** রচিত 'সেক শুভোদয়া' সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য।
- গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
- এ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার যে সব নিদর্শন আছে তা হল- **পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা ছড়া বা আর্যা, খনার বচন ও ভাটিয়ালি রাগের একটি প্রেমসঙ্গীত**।

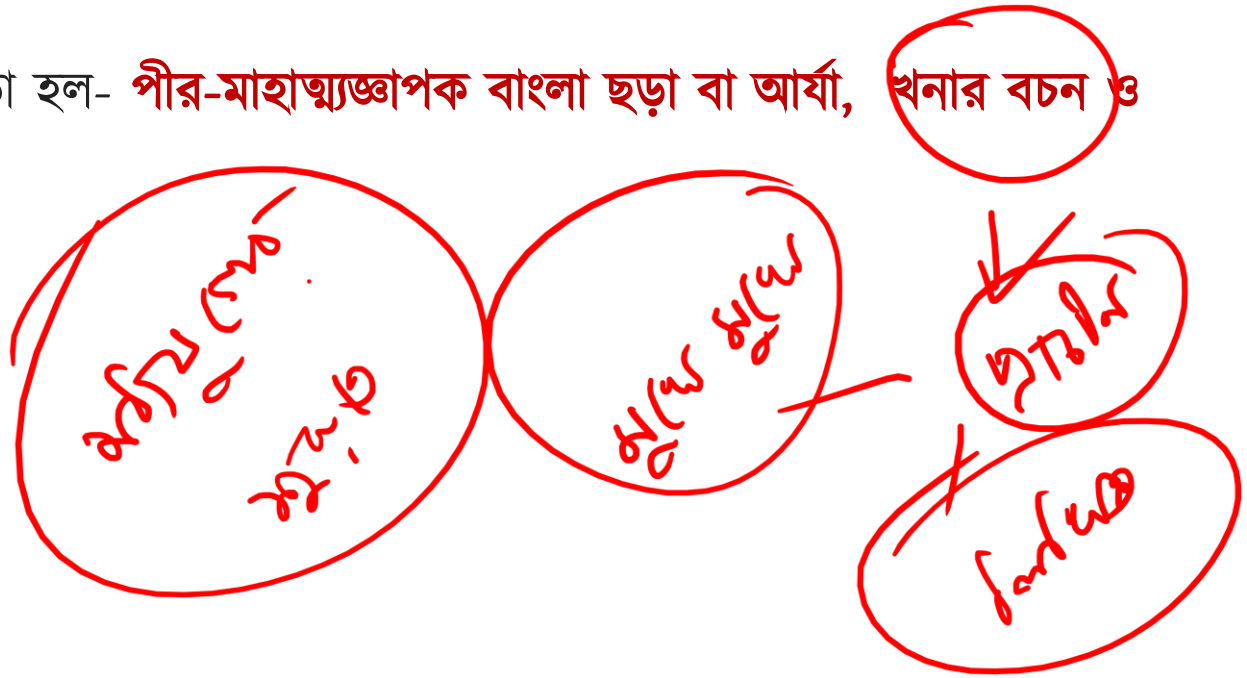

P2A

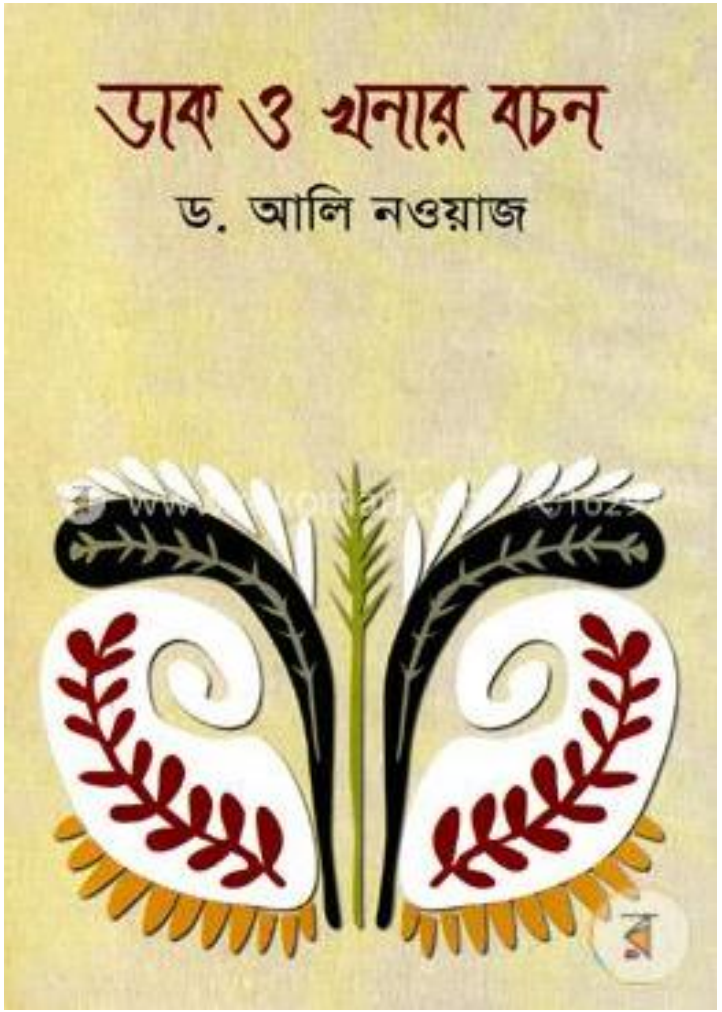

ডাক ও খনার বচন

- ‘ডাক ও খনার বচন’ কে বাংলা **সাহিত্যের প্রাচীনযুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়**। কিন্তু এগুলো বিকাশ লাভ করে মধ্যযুগের শুরুতে।

- ডাকের বচনে **সাধারণত জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের** ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।

- **অপরদিকে খনার বচনে ‘কৃষি ও আবহাওয়া’র কথা প্রধান্য পেয়েছে।**

প্রশ্নোত্তর

শূন্যপুরাণ রচনা করেছেন-

- রামাই পণ্ডিত
- শ্রীকর নন্দী
- বিজয় গুপ্ত
- লোচন দাস

প্রশ্নোত্তর

বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে বুঝায়?

১১৯৯-১২৫০

১২০১-১৩৫০

১২৫০-১৩৫০

১২৫০-১৪৫০

মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম

অন্ধকার যুগ পরবর্তী মধ্যযুগের সাহিত্য কর্মকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা চলে।

অনুবাদ:

মৌলিক: মঙ্গল কাব্য

বৈষ্ণব পদাবলী

জীবনী সাহিত্য

লোকসাহিত্য ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য** ।

সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথি **১৯০৯** সালে **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ** ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার **কাঁকিল্যা** গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের **গোয়াল ঘরের** টিনের চালের নীচ থেকে আবিষ্কার করেন।

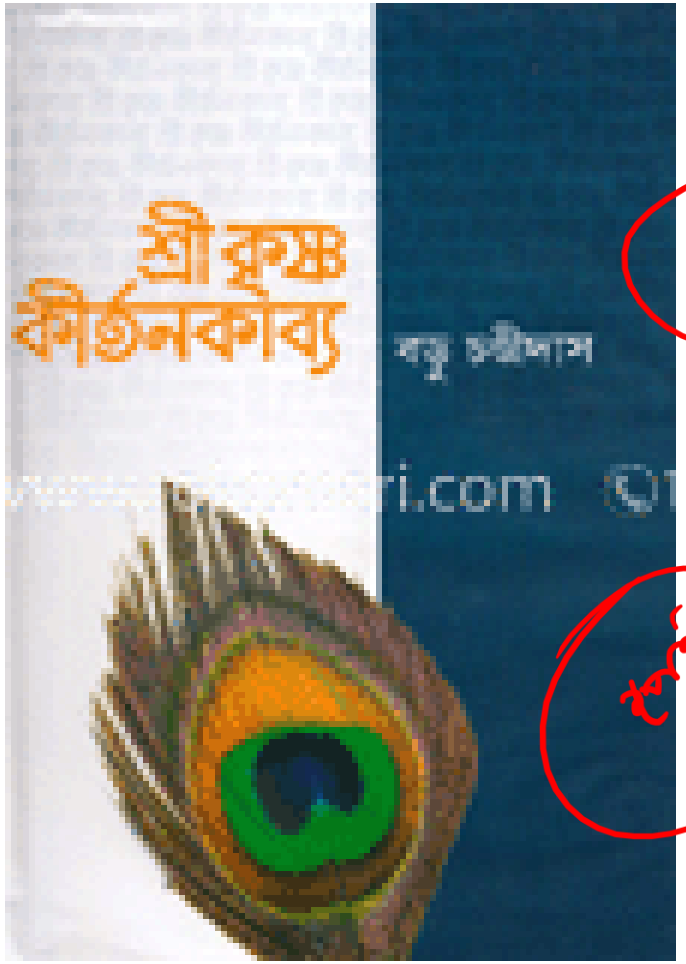

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১৯১৬ সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন** নামে।

পুথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহই এই কাব্যের মূল বিষয়। এ কাব্যের কাহিনি বাহ্যিক দিক থেকে পৌরাণিক রাধার অনুসারী, কিন্তু তা মূলত লোকজীবনকে ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে।

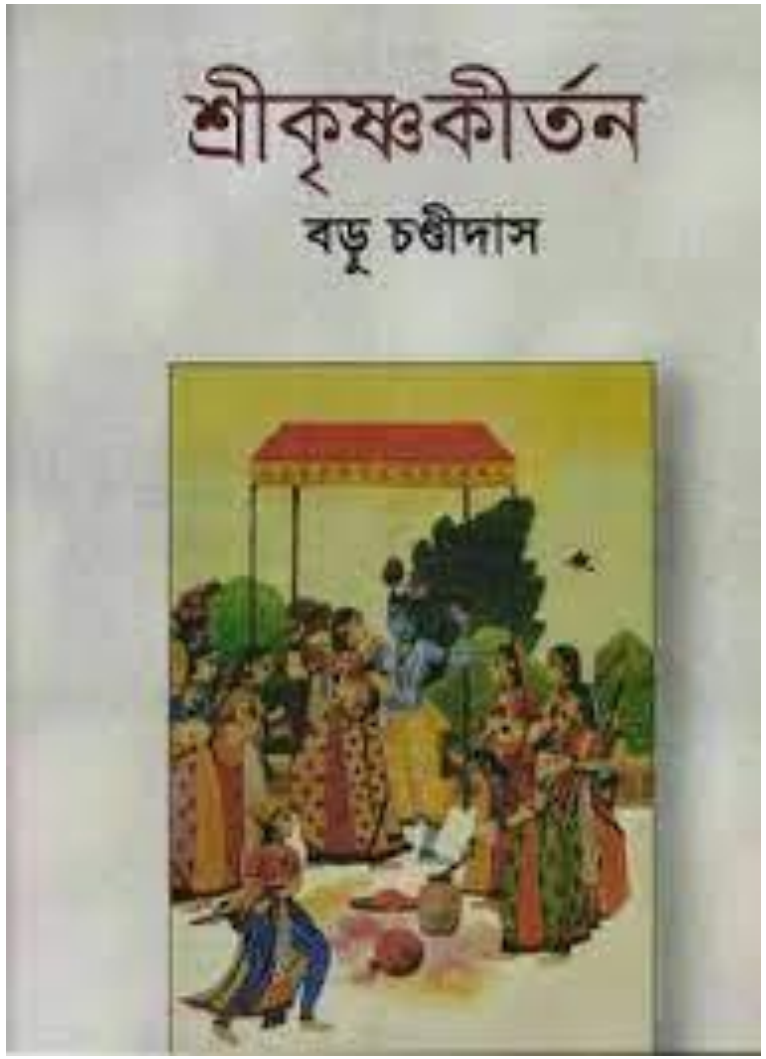

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের তের খণ্ড

আখ্যায়িকাটি মোট **১৩** খণ্ডে বিভক্ত।

জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।

১২টি অংশ 'খণ্ড' নামে লেখা হলেও অন্তিম অংশটির নাম শুধুই 'রাধাবিরহ'। এই অংশটির শেষের পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায়নি।

P2A

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের চরিত্র

কাব্যের প্রধান চরিত্র রাধা

কাব্যের প্রধান **তিনটি** চরিত্র **রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই**

প্রধান চরিত্র রাধা, বাবার নাম **সাগর, মা পদ্মা**।

রাধার স্বামীর নাম : আইহান ঘোষ বা আয়ান ঘোষ বা অভিমন্যু ঘোষ ।

নায়ক কৃষ্ণ, পিতার নাম **বসুদেব,** মাতার নাম **দেবকী**।

P2A

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাব্য হলেও তা লৌকিক কাহিনীকাব্য।

এতে কোনো আধ্যাত্মিক আবেদন নেই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেম দৈহিক কামনা-বাসনার বাহিরে যেতে পারেনি।

তাই এ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ **জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক নয়।**

এটি মূলত **নাট্যগীতি** শ্রেণির

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আঙ্গিক বা গঠনগত দিক থেকে **নাটগীতি**,

প্রকরণে **পদাবলি**।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের তের খণ্ড

প্রথম সর্গ জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় রাধাকৃষ্ণের জন্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বসুদেবের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এবং বৃন্দাবনে নন্দের গৃহে স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবী সাগর গোয়ালার ঘরে পদুমার গর্ভে রাধারূপে জন্ম নেয়।

তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে আয়ান ঘোষের পত্নী রাধাকে তাম্বুলাদি প্রেরণ করে, কিন্তু স্বরূপবিস্মৃতা রাধাকর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

দানখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহায়তায় রাধার দধিদুগ্ধের পসার নষ্ট করে রাধাকে বলপর্বক সম্ভোগ করে।

নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ যমুনায় কাণ্ডারী সেজে গোপীগণকে পার করে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জলবিহারে মগ্ন হয়। এখান থেকেই রাধার মনের প্রতিকূলতা দূর হতে থাকে।

ভারখণ্ডে কৃষ্ণ ভারবাহীরূপে রাধার পসরা বহন করে। ছত্রখণ্ডে রাধাকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের ছত্রধারণ এবং রাধাকর্তৃক রতিদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়।

বৃন্দাবনখণ্ডে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বনবিহার এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন।

যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের কালিয় নাগের দমন, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলবিহার এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

হারখণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্য যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ।

বাণখণ্ডে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণ রাধার প্রতি মদনবাণ নিক্ষেপ করে, এতে রাধা মূর্ছা যায়। ফলে কৃষ্ণের মনে অনুতাপ জাগে, বড়াই কৃষ্ণকে বন্ধন করে। পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে বন্ধনমোচন করা হয়। কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য সম্পাদন করে এবং উভয়ের মিলন ঘটে।

বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার মনে প্রবল উৎকণ্ঠা জাগে, রাধা কৃষ্ণের বংশী অপহরণ করে এবং পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে তা ফেরত দেয়।

রাধাবিরহে রাধার বিরহ, উভয়ের মিলন, রাধার নিদ্রা এবং সেই অবকাশে কৃষ্ণের কংসবধের জন্য মথুরা যাত্রা। এর পর কাব্য খণ্ডিত।

P2A

উ. নিম্নে খণ্ড অনুযায়ী কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

জন্ম খণ্ড : কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মর্ত্যে মানবরূপে জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণ পাপী কংস রাজাকে বধ করার জন্য দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। জন্মের পরেই বাসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে অনেক দুরে বৃন্দাবনে জনৈক নন্দ গোপের কাছে রেখে আসে। সেখানেই দৈব ইচ্ছায় রাধা আরেক গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয়। দৈব নির্দেশেই বালিকা বয়সে নপুংসক আইহন বা আয়ান গোপের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আয়ান গোচারণ করতে গেলে রাধাকে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

তাম্বুল খণ্ড: অন্য গোপ বালিকাদের সাথে রাধা মথুরাতে দই-দুধ বিক্রি করতে যায়। বড়ায়িও যায় তার সাথে। বৃদ্ধা বড়ায়ি পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলে এবং রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে, এমন রূপসীকে দেখেছে কিনা? রাধার রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ পূর্বরাগ অনুভব করে। সে বড়ায়িকে বুঝিয়ে রাধার জন্য পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু বিবাহিতা রাধা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

দান খণ্ড: কৃষ্ণ দই-দুধ বিক্রির জন্য মথুরাগামী রাধা ও গোপীদের পথ রোধ করে। তার দাবী নদীর ঘাটে পারাপার-দান বা শুল্ক দিতে হবে, অন্যথায় রাধার সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে। রাধা কোনভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি হয় না। এদিকে তার হাতে কড়িও নেই। রাধা নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চাইলো; কৃষ্ণের হাত থেকে বাচাঁর জন্য বনে দৌড় দিল। কৃষ্ণ পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম হয়।

নৌকা খণ্ড: পরবর্তীতে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে। একজন পার করা যায় এমন একটি নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধার সঙ্গ লাভ করে। নদীতীর উঠে লোকলজ্জার ভয়ে রাধা সখীদের বলে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ তার জীবন বাঁচিয়েছে, কৃষ্ণ না থাকলে সে ডুবে মারা যেত।

ভার খণ্ড: শরৎকালে শুকনো পথঘাট, তাই হেঁটেই মথুরাতে গিয়ে দুধ-দই বিক্রি করা যায়। কিন্তু রাধা আর বাড়ির বাইরে আসে না। আগের ঘটনাগুলো সে শাশুড়ি বা স্বামীকেও ভয়ে ও লজ্জায় খুলে বলেনি। রাধা অদর্শনে কৃষ্ণ কাতর। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার শাশুড়িকে বোঝায়, ঘরে বসে থেকে কি হবে, রাধা দই-দুধ বেঁচে কটি পয়সা তো আনতে পারে। শাশুড়ির নির্দেশে রাধা বাইরে বের হয়। কিন্তু প্রচণ্ড রোদে কোমল শরীরে দুধ-দই বহন করতে গিয়ে রাধা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এসময় কৃষ্ণ ছদ্মবেশে মজুরি করতে আসে। পরে ভার বহন অর্থাৎ মজুরির বদলে রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা এই চতুরতা বুঝতে পারে। সে কাজ আদায়ের লক্ষ্যে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। তাই কৃষ্ণ আশায় আশায় রাধার পিছু পিছু ভার নিয়ে মথুরা পর্যন্ত আসে।

ছত্র খণ্ড: দুধ-দই বেচে মথুরা থেকে এবার ফেরার পালা। কৃষ্ণ তার প্রাপ্য আলিঙ্গন চাইছে। রাধা চালাকি করে বলে, 'এখনো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের মাথায় ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত চলো। পরে দেখা যাবে।' কৃষ্ণ ছাতা ধরতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তবু আশা নিয়েই কৃষ্ণ ছাতা ধরেই চলল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ করেনি রাধা।

বৃন্দাবন খণ্ড: রাধার বিরুদ্ধ আচরণ কৃষ্ণের ভাবান্তর ঘটায়। সে অন্য পথ অবলম্বন করে। কৃষ্ণ কটু বাক্য না বলে, দান বা শুল্ক আদায়ের নামে বিড়ম্বনা না করে, বরং বৃন্দাবনকে অপূর্ব শোভায় সাজিয়ে তুলে। রাধা ও গোপীরা সেই শোভা দর্শন করে কৃষ্ণের উপর রাগ ভুলে যায়। কৃষ্ণ সব গোপীকে দেখা দেয়। পরে রাধার সঙ্গে তার দর্শন ও মিলন হয়।

কালিয়দমন খণ্ড: বৃন্দাবনের উপর দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত। এ যমুনায় কালিয়নাগ বাস করে। কালিয়নাগের বিষে যমুনার জল বিষাক্ত। কৃষ্ণ কালিয়নাগকে তাড়াতে নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। দৈব ইচ্ছায় ও কৃষ্ণের বীরত্বে কালিয়নাগ পরাস্ত হয় এবং দক্ষিণ সাগরে বসবাস করতে যায়। কালিয়নাগের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন জলযুদ্ধে লিপ্ত তখন রাধার বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

যমুনা খণ্ড: রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে নেমে হঠাৎ ডুব দিয়ে আর ওঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ ডুবে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ লুকিয়ে কদম গাছে বসে থাকে। রাধা ও সখিরা জলে নেমে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ নদীতীরে রাধার খুলে রাখা হার চুরি করে আবার গাছে গিয়ে বসে।

হার খণ্ড: রাধা কৃষ্ণের চালাকি বুঝতে পারে। হার না পেয়ে রাধা কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে। কৃষ্ণও মিথ্যে বলে মাকে। কৃষ্ণ বলে, 'আমি হার চুরি করব কেন, রাধাতো পাড়ার সম্পর্কে আমার মামি।' বড়ায়ি সব বুঝতে পারে এবং রাধার স্বামী আয়ান হার হারানোতে যাতে রাগান্বিত না হয় সেজন্য বলে যে, 'বনের কাঁঠায় রাধার গজমতির হার ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে।'

বাণ খণ্ড: কৃষ্ণ রাধার উপর ক্রুদ্ধ হয় মায়ের কাছে নালিশ করার জন্য। রাধাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নয়। বড়ায়ি বুদ্ধি দিলো, কৃষ্ণ যেন শক্তির পথ পরিহার করে মদনবাণ প্রেমে রাধাকে বশীভূত করে। সে মতো কৃষ্ণ পুষ্পধনু নিয়ে কদমতলায় বসে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাণে মূর্ছিত ও পতিত হয়। এরপর কৃষ্ণ রাধাকে চৈতন্য ফিরিয়ে দেয়। রাধা কৃষ্ণ প্রেমে কাতর হয় এবং কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরে।

বংশী খণ্ড: কৃষ্ণ রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য সময়-অসময়ে বাঁশিতে সুর তোলে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়, মন কুমারের চুল্লির মতো পুড়তে থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না। ভোর বেলা কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মূর্ছা যায়। বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দেয়, সারারাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় কৃষ্ণ বাঁশি শিয়রে রেখে ঘুমায়। তুমি সেই বাঁশি চুরি করো, তবেই সকল সমস্যার সমাধান হবে। বড়াইয়ের বুদ্ধি শুনে রাধা তাই করে। কিন্তু কৃষ্ণ বুদ্ধিমান, তাই বাঁশি চোর কে তা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। রাধা কৃষ্ণকে বলে, বড়ায়িকে স্বাক্ষী রেখে কৃষ্ণের কথা দিতে হবে যে, 'সে কখনো রাধার কথার অবাধ্য হবে না এবং রাধাকে ত্যাগ করে যাবে না, তবেই বাঁশির সন্ধান মিলতে পারে।' কৃষ্ণ কথা দিয়ে বাঁশি ফিরে পায়।

বিরহ খণ্ড: তারপর কৃষ্ণ রাধার উপর উদাসীনতা প্রকাশ করে। মধুমাস সমাগত, তাই রাধা বিরহ অনুভব করে। রাধা বড়ায়িকে বলে, কৃষ্ণকে এনে দিতে। দুধ-দই বিক্রির ছল করে রাধা নিজেও কৃষ্ণকে খোঁজার জন্য বের হয়। অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে, 'তুমি আমাকে নানা সময় লাঞ্ছনা করেছো, ভার বহন করিয়েছো, মায়ের কাছে আমার নামে বিচার দিয়েছো, তাই তোমার উপর আমার মন উঠে গেছে।' রাধা বলে, 'তখন আমি বালিকা ছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তির্যক দৃষ্টি হলেও তুমি আমার দিকে তাঁকাও।' কৃষ্ণ বলে, 'বড়ায়ি যদি আমাকে বলে যে তুমি রাধাকে প্রেম দাও, তাহলে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারি।' অবশেষে বড়ায়ি রাধাকে সাজিয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধা ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ নিদ্রিতা রাধাকে রেখে কংস বধ করার জন্য মথুরাতে চলে যায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না দেখে রাধা আবার বিরহকাতর হয়ে পড়ে। রাধার অনুরোধে বড়ায়ি কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মধুরাতে কৃষ্ণকে পেয়ে অনুরোধ করে, 'রাধা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তুমি উন্মাদিনীকে বাঁচাও।' কিন্তু কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে চায় না এবং রাধাকে গ্রহণ করতেও চায় না। কৃষ্ণ বলে, 'আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কটুকথা সহ্য করতে পারি না। রাধা আমাকে কটুকথা বলেছে।' ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এখানেই ছিন্ন। পরবর্তী পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। তাই এ গ্রন্থের সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় না।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ

P2A

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ । যে কাব্য পাঠ করলে কল্যাণ হয় এবং সকল প্রকার অকল্যাণ দূর হয় সে কাব্যই মঙ্গলকাব্য ।**মঙ্গলকাব্য ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য**।

মূল উপজীব্য হলো দেবদেবীর গুণগাণ।

এ কাব্য ধারায় **নারী দেবতাদের** প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য :

১) মঙ্গলকাব্য এক ধরনের কাহিনি কাব্য ।

২) নায়ক-নায়িকা সবাই শাপগ্রস্ত দেব-দেবী, শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান

৩)মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেব-দেবীরা মানুষের মতো আচরণ করে

৪) মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫টি খণ্ড থাকে ।

P2A

মঙ্গল কাব্যের প্রধান ৩টি শাখা

- মনসা মঙ্গল
- চণ্ডী মঙ্গল
- অন্নদা মঙ্গল

মনসামঙ্গল

সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মঙ্গল কাব্য- মনসামঙ্গল।

সাপের দেবী মনসার স্তব, স্তুতি, কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে রচিত কাব্য মনসামঙ্গল। সমাজের নিচু শ্রেণিতে মনসা পূজার প্রচলন ঘটে। মনসা দেবীর পুজা প্রচার ও দেবী মনসার গুণকীর্তণ। এর মূল উপজীব্য

মনসামঙ্গল

মনসা সাপের দেবী, শিবের মানস কন্যা ।

মনসার অন্য নাম : কেতকা, পদ্মাবতী ।

মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র-

মনসা, সনকা, নেতা ধোপানি,

লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর

P2A

মনসামঙ্গল

মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র :

চাম্পাই নগরের বণিক চাঁদ সদাগর

মধ্যযুগের সবচেয়ে পতিপ্রাণা চরিত্র :

উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা

স্বর্গের ধোপা : নেতা ধোপানি ।

P2A

মনসামঙ্গলের আদি কবি

কানা হরিদত্ত

P2A

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলে ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন

বিজয় গুপ্ত – শ্রেষ্ঠ কবি (পদ্মপুরাণ)

দ্বিজ বংশীদাস

বিপ্রদাস পিপিলাই (মনসা বিজয়)

P2A

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ

A. চম্পক নগরের অধীশ্বর বণিক চাঁদ সদাগর। জগতপিতা শিবের মহাভক্ত। চাঁদ জগতপিতা শিবের থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। মানুষের পূজা ব্যতীত দেবত্ব অর্জন সম্ভবনয়, তাই মনসা চাঁদের কাছে পূজা চাইলেন। শিবভিন্ন অপর কাউকে পূজা করতে চাঁদদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকি পত্নী সনকার মনসার ঘটে হেঁতালদণ্ড দিয়ে আঘাত করেন। পরিণামে মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং ছয়পুত্রকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। তারপর সমুদ্রপথে চাঁদের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করেন। চাঁদ কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। মনসা ছলনা করে স্বর্গের নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষাকে মর্ত্যে পাঠালেন। অনিরুদ্ধ চাঁদের ঘরে জন্ম নেয় লখিন্দর রূপে, আর উজানী শহরে সাধুবণিকের ঘরে বেহুলারূপে ঊষা জন্ম নেয়। বহুকাল পরে সহায় সম্বলহীন চাঁদ চম্পক নগরে পাগল বেশে আসে। অবশেষে পিতা পুত্রের মিলন ঘটল।

বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ স্থির হল। মনসা বৃদ্ধা বেশে এসে ছল করে বেহুলাকে শাপ দিল, 'বিভা রাতে খাইবা ভাতার'। সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বানানো হল। ছিদ্র পথে কালনাগিনী ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করল। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে পাড়ি দিল। বহু বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে নেতা ধোবানির সাহায্যে দেবপুরে পৌঁছে নাচের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করল। তখন দেবতাদের আদেশে মনসা সব ফিরিয়ে দিল। বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চৌদ্দ ডিঙা। চাঁদ পাগলের মত ছুটে আসলো বেহুলার কাছে। এসে শুনলো যে তাকে মনসার পূজা করতে হবে। কিন্তু এ শর্ত চাঁদ প্রত্যাখান করলো। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়ল চাঁদের পায়ে এবং চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হল। চাঁদ হেলাভরে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল ছুঁড়ে দিল। মনসা এতেই খুশি। মর্ত্যবাসের মেয়াদ ফুরালে বেহুলা-লখিন্দর আবার ইন্দ্রসভায় পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পূজা।

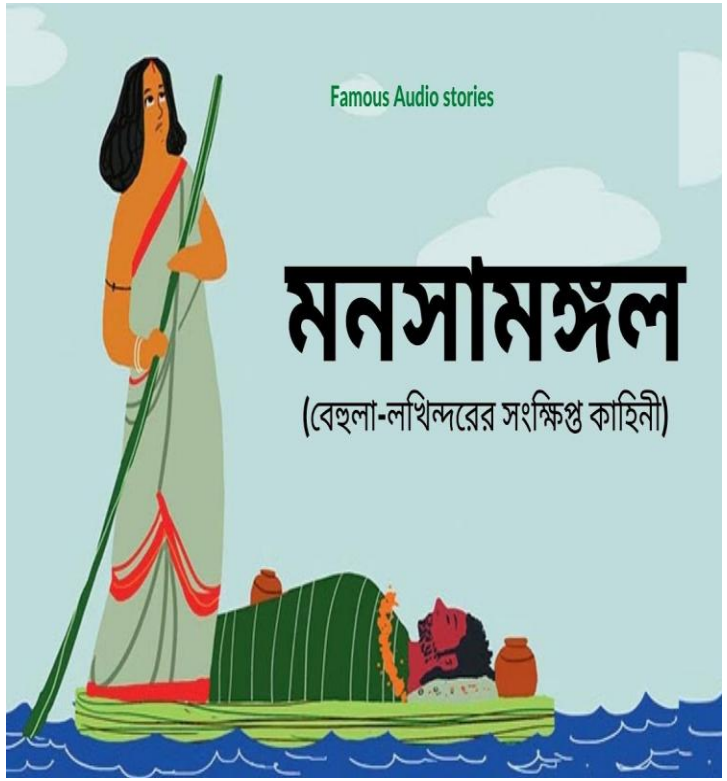

P2A

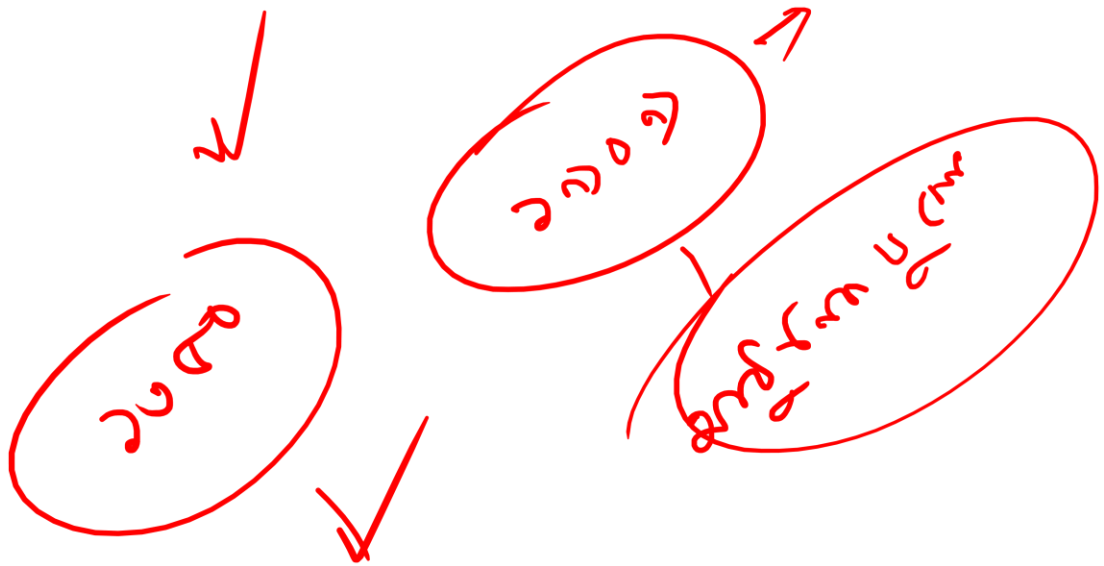

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

দেবী চণ্ডী শিবের/মহাদেবের স্ত্রী

চন্ডী দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি নিয়ে চণ্ডী মঙ্গল কাব্য রচিত হয়।

ষোড়শ শতকে চন্ডীমঙ্গল কাব্যর সর্বাধিক প্রসার ঘটে।

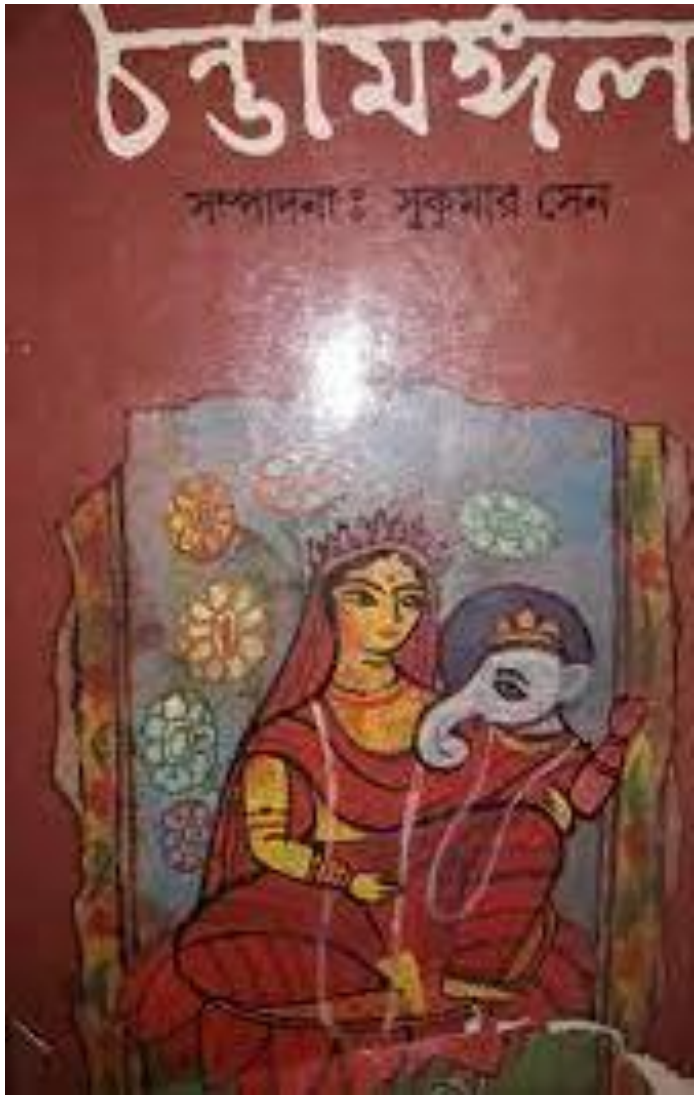

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম **মানিক দত্ত**।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার **সর্বশ্রেষ্ঠ কবি** **কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী**

কবি মুকুন্দরাম জন্মগ্রহন করেন বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে।

মুকুন্দ রামকে **'কবিকঙ্কন'** উপাধি দেন মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার রঘুনাথ চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য।

P2A

কাহিনি ও চরিত্র

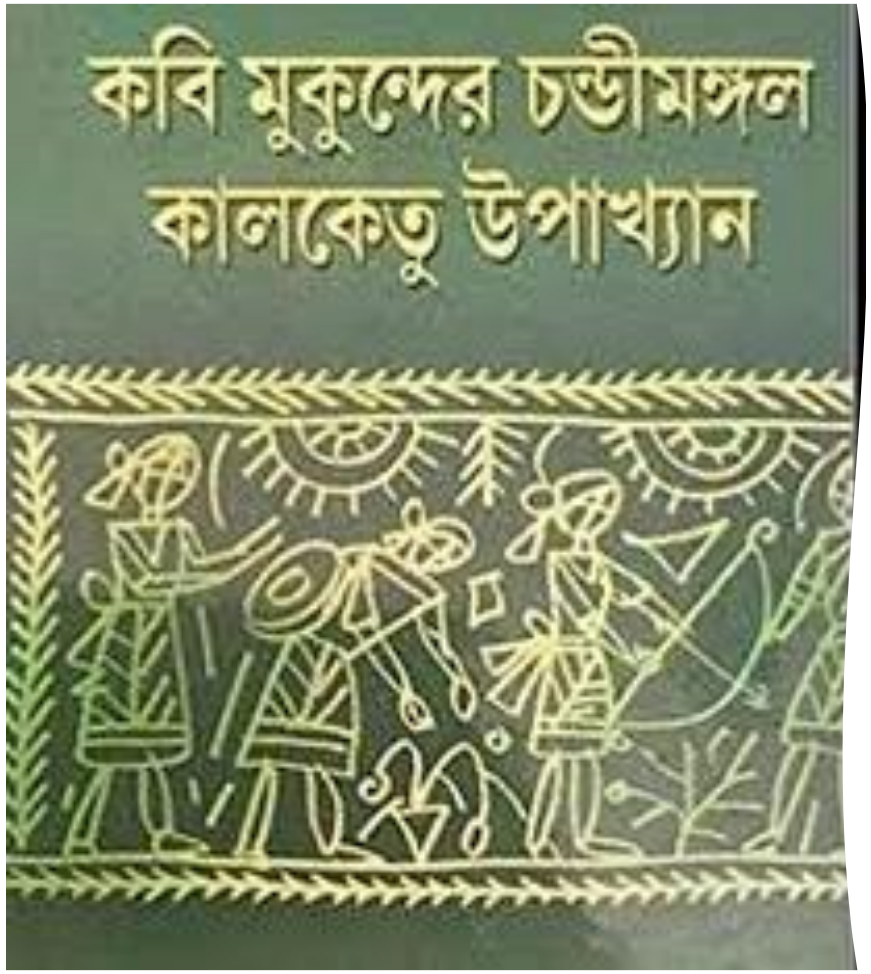

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত

১) আক্ষেটিক খণ্ড ২) বণিক খণ্ড ।

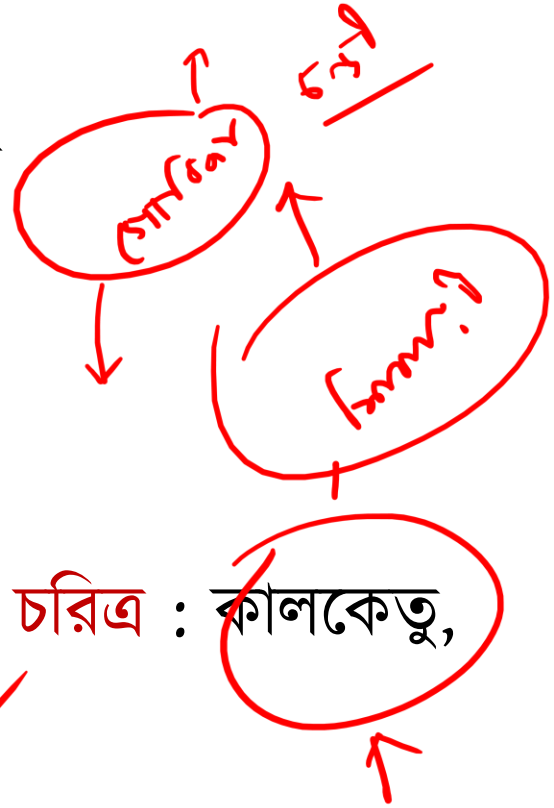

আক্ষেটিক (ব্যাধ বা শিকারী) খণ্ডের চরিত্র : কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল।

বণিক খণ্ডের চরিত্র : ধনপতি সদাগর, লহনা, খুল্লনা।

P2A

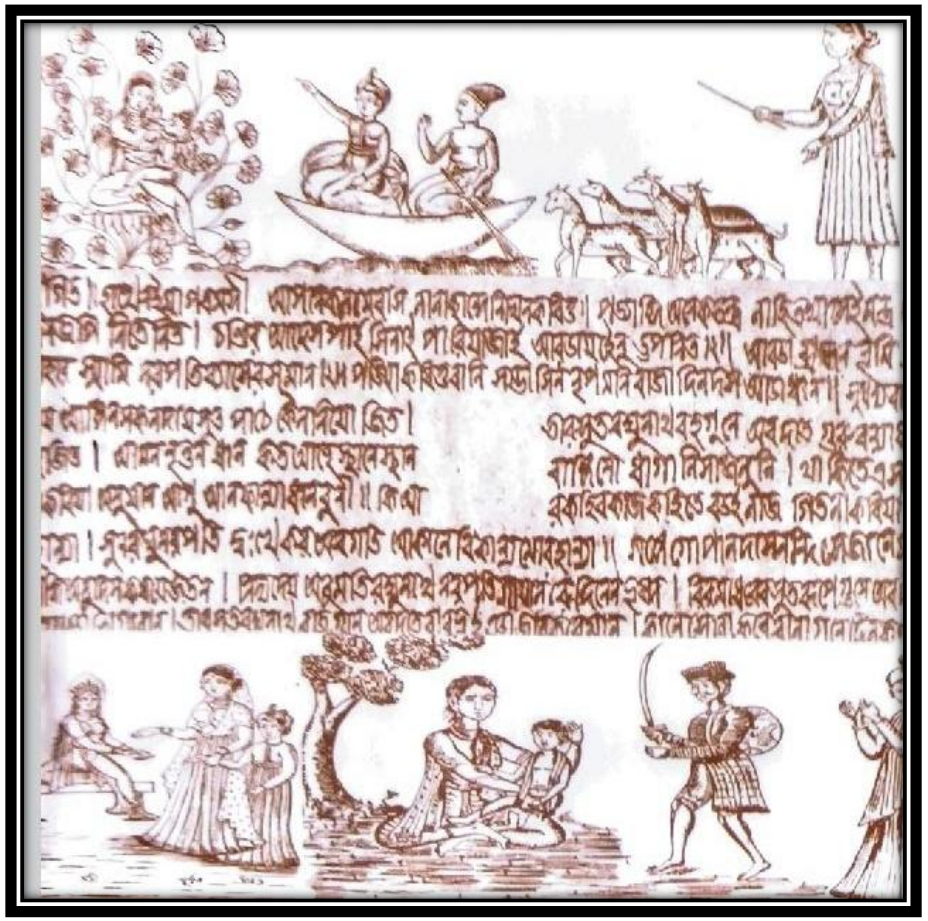

চন্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্র

মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র : ফুল্লরা

মধ্যযুগের সবচেয়ে ষড়যন্ত্রকারী বা খল চরিত্র : ভাঁড়ুদত্ত ।

মধ্যযুগের সবচেয়ে ঠক বা প্রতারক বা ধূর্ত চরিত্র : মুরারীশীল

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ

দেবীর অনুরোধে শিব তার ভক্ত নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে মর্ত্যলোকে পাঠান। নীলাম্বর কালকেতু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কালকেতুর যৌবনপ্রাপ্তির পর তার পিতা ধর্মকেতু ফুল্লরার সাথে বিবাহ দেন। ব্যাধ কালকেতুর অতি দরিদ্র কিন্তু সুখী সংসার। এদিকে কালকেতুর শিকারে প্রায় নির্মূল কলিঙ্গের বনের পশুদের আবেদনে কাতর হয়ে দেবী স্বর্ণগোধিকা রূপে কালকেতুর শিকারে যাবার পথে প্রকট রূপ ধারণ করেন। কালকেতু শিকারে যাবার সময় অমঙ্গলজনক গোধিকা দেখার পর কোন শিকার না ক্রুদ্ধ হয়ে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে ঘরে নিয়ে আসেন। কালকেতু গোধিকাকে ঘরে বেঁধে পত্নীর উদ্দেশ্যে হাটে রওনা হন। হাটে ফুল্লরার সাথে দেখা হলে তাকে গোধিকার ছাল ছাড়িয়ে শিক পোড়া করতে নির্দেশ দেন। ফুল্লরা ঘরে ফিরলে, দেবী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে ফুল্লরাকে দেখা দিলেন। ফুল্লরার প্রশ্নের উত্তরে দেবী জানালেন যে, তার স্বামী ব্যাধ কালকেতু তাকে এখানে এনেছেন এবং তিনি এ গৃহেই কিছুদিন বসবাস করতে চান। দেবীকে তাড়াতে ফুল্লরা নিজের বারমাসের দুঃখকাহিনী বিবৃত করলেন, তবুও দেবী অটল। শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা ছুটলেন হাটে, স্বামীর সন্ধানে। উভয়ে গৃহে ফেরার পর দেবীর অনুগ্রহে কালকেতু ধনী হয়ে পশু শিকার ত্যাগ করলেন। বনের পশুরাও নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগল । দেবীর আশীর্বাদে ধনলাভ করে কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করেন। গুজরাট নগরে নবাগতদের মধ্যে ভাঁড়দত্ত নামে ছিল এক প্রতারক। প্রথমে কালকেতু তাকে বিশ্বাস করলেও প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করায় তাকে তাড়িয়ে দেন। ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গের রাজার কাছে গিয়ে তাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। কলিঙ্গের সেনাপতি গুজরাট আক্রমণ করে কালকেতুকে বন্দী করেন। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তি পান এবং কাল পূর্ণ হলে ফুল্লরাসহ স্বর্গে ফিরে যান।

P2A

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি দুটি।

(ক) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি এবং

(খ) লাউসেনের কাহিনি

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি **ময়ূর ভট্ট**। **'হাকন্দপুরান'** ময়ূর ভট্ট রচিত কাব্য গ্রন্থ।

ঘনরাম চক্রবর্তী (শ্রী ধর্মমঙ্গল) ধর্ম মঙ্গল কাব্যের **সর্বশ্রেষ্ঠ কবি**।

অন্নদামঙ্গল

দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার।

অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা

ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর।

P2A

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ট কবি এবং মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সুপরিচিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

১৭১২

ভারতচন্দ্রকে **'রায় গুণাকর'** উপাধি প্রদান করেন **নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র**। ভারতচন্দ্র সভাকবি ছিলেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের প্রথম নাগরিক কবি। (১৭১২-১৭৬০)

তিনি সমসাময়িক নাগরিক রস ও রুচির প্রতিনিধি হিসেবে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্নদামঙ্গল কাব্যকে বলেছেন **‘রাজকণ্ঠের মণিমালা’**।

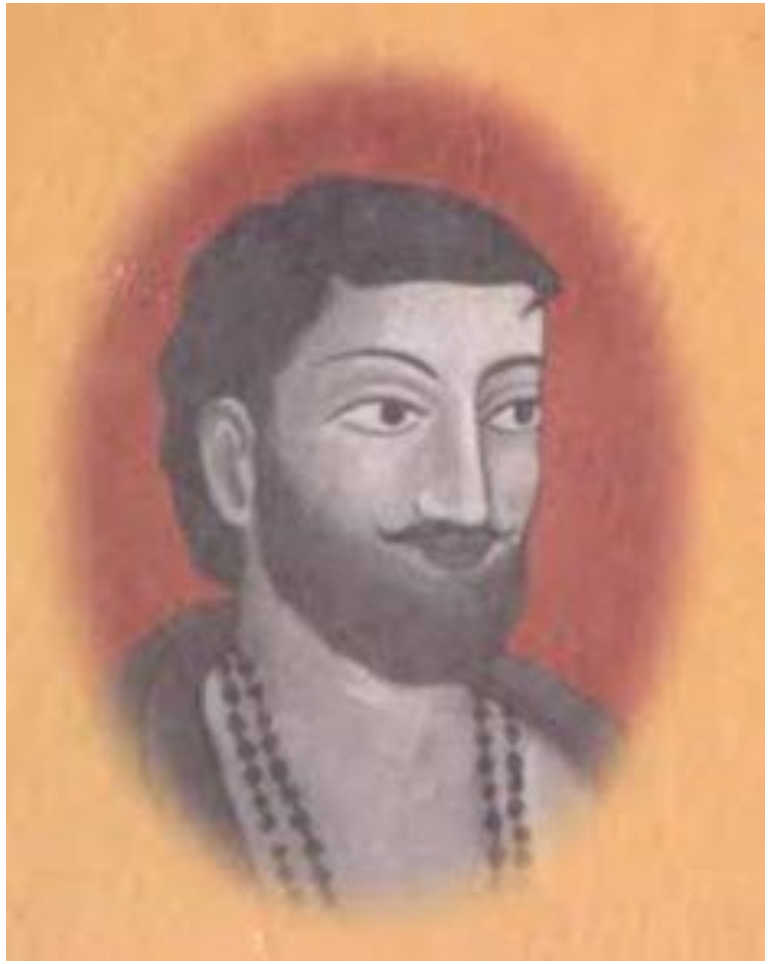

অন্নদামঙ্গল

সমগ্র কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত:

(ক) শিবায়ন অন্নদামঙ্গল

(খ) বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল

(গ) মানসিংহ অন্নদামঙ্গল (অন্নপূর্ণামঙ্গল)

অন্নদামঙ্গল কাব্যের চরিত্র

হীরা মালিনী

ঈশ্বরী পাটনি

ভবানন্দ, মানসিংহ, সুন্দর, বিদ্যা।

P2A

অন্নদামঙ্গল প্রবচন

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

নগর পুড়িলে দেবালয় এড়ায়না।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।

জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরিয়সী।

বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।

বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।

কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।

মঙ্গলকাব্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র

মনসা, সনকা, নেতা ধোপানি, লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর

চন্ডীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র

আক্ষেটিক (ব্যাধ বা শিকারী) খণ্ডের চরিত্র: কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল।
বণিক খণ্ডের চরিত্র: ধনপতি সদাগর, লহনা, খুল্লনা,

অন্নদামঙ্গল কাব্যের চরিত্র: ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী, মানসিংহ, ভবানন্দ, সম্রাট জাহাঙ্গীর, রাজা প্রতাপাদিত্য।

মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র: ফুল্লরা
মধ্যযুগের সবচেয়ে ষড়যন্ত্রকারী বা খল চরিত্র: ভাঁড়ুদত্ত
মধ্যযুগের সবচেয়ে ঠক বা প্রতারক বা ধূর্ত চরিত্র: মুরারীশীল

P2A

এক নজরে মঙ্গলকাব্য

কাব্যধারা	আদি কবি	শ্রেষ্ঠ কবি	চরিত্র
মনসামঙ্গল	কানাহরি দত্ত	বিজয় গুপ্ত	চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর
চণ্ডীমঙ্গল	মানিক দত্ত	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়দত্ত
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়	ভারতচন্দ্র রায়	ঈশ্বরী পাটনী
ধর্মমঙ্গল	ময়ুরভট্ট	ঘনরাম চক্রবর্তী	রাজা হরিশ্চন্দ্র, লাউসেন

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব ধর্মমতকে কেন্দ্র করে যে বৈচিত্র্যধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বৈষ্ণব সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা হয়।

P2A

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ।

চৈতন্যদেব ও কয়েকজন প্রধান অনুচরের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত **জীবনী সাহিত্য**।

পদাবলি সাহিত্য বা বৈষ্ণব পদাবলি।

জীবনী সাহিত্য

কোন ক্ষণজন্মা মহৎ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য নির্মিত হয়, তাকে জীবনী সাহিত্য বলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে 'জীবনী সাহিত্য' নামে এক নতুন সাহিত্য ধারার সূচনা হয়।

বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রী চৈতন্যদেব এবং তাঁর কয়েকজন ভাব শিষ্যের জীবনকাহিনি নিয়ে জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি।

P2A

জীবনী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে **প্রথম জীবনী সাহিত্য রচিত হয় শ্রী চৈতন্যকে** নিয়ে।

চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্য কড়চা নামে অভিহিত হয়।

কড়চা অর্থ হলো ডায়েরি বা দিনলিপি

তবে বাংলা ভাষায় কড়চা হলো চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অপরিসীম।

বাংলায় একটি পংক্তি না লিখলেও উনার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রী চৈতন্যদেব কে?

শ্রী চৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম ছিল **বিশ্বম্ভর,** নিম বৃক্ষের নিচে জন্মগ্রহণ করেন বলে ডাকনাম ছিল **'নিমাই'**। তবে গায়ের রং গৌরবর্ণ ছিল বলে সবাই ডাকত **'গৌরাঙ্গ'** বা সংক্ষেপে গোরা বলে।

শ্রীচৈতন্য দেব একজন **বাঙালি হিন্দু সন্ন্যাসী** এবং ষোড়শ শতাব্দীর **বিশিষ্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক**। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলে হিন্দু সমাজে ভাঙন ধরে। ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিম্নবিত্ত হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। চৈতন্যদেব সে ভাঙন রোধ করার জন্য প্রেমধর্মের প্রচার করেন এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে **বৈষ্ণব ধর্মের ছায়াতলে একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন**। তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্ম, প্রেমকথা বাঙালির জীবন চেতনায় অভূতপূর্ব আনন্দ ও জাগরণ এনে দিল। ফলে বাঙালি হিন্দুদের আচারসর্বস্ব দেবদেবী নির্ভর সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

জীবনী সাহিত্যের কবি

মুরারিগুপ্ত	তিনি জীবনী **সাহিত্যের আদি কবি** । তিনি **সংস্কৃত ভাষায়** কাব্য রচনা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর নাম দেন কবিকর্ণপুর । তার কাব্যের নাম ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম্’। শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংক্রান্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রহণযোগ্য তথ্য উপস্থাপনে সক্ষম হয়, কারণ এর লেখক ব্যক্তিগতভাবে শ্রীচৈতন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন
বৃন্দাবন দাস	**বাংলা ভাষায়** জীবনী সাহিত্যের আদি কবি । জন্ম: খ্রিষ্টাব্দ । তাঁর কাব্যের নাম: শ্রীচৈতন্যভাগবত'
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	তিনি জীবনী সাহিত্যের **শ্রেষ্ঠ কবি**। তাঁর কাব্যের নাম ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১৫)।
লোচন দাস	তাঁর কাব্যের নাম: চৈতন্যমঙ্গল
গোবিন্দ দাস	‘গোবিন্দদাসের কড়চা'

P2A

পদাবলির বিষয়বস্তু

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাই হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু।

বৈষ্ণব সাধকদের ভাষায় রাধা হচ্ছে সৃষ্টি বা জীবাত্মা এবং কৃষ্ণ হচ্ছে স্রষ্টা বা পরমাত্মা।

এই জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার (স্রষ্টা ও সৃষ্টি) বিরহ-মিলনের রূপক উপস্থিতিই বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু। **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি**

P2A

পদাবলী সাহিত্যের চতুষ্টয়

- বিদ্যাপতি
- চন্ডীদাস
- গোবিন্দদাস
- জ্ঞানদাস

গীতগোবিন্দম - জয়দেব

কবি জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি।

তিনি গীতগোবিন্দম্ কাব্যের রচয়িতা। (সংস্কৃত ভাষা)

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির সূচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলি থেকেই বলে ধারণা করা হয়।

কবি জয়দেবকে বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা।

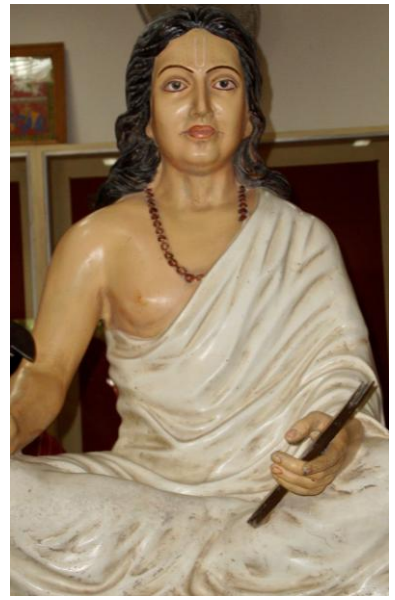

বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর

বিদ্যাপতি

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা এবং প্রথম অবাঙালি কবি।

বিদ্যাপতির উপাধি 'কবি কণ্ঠহার' (রাজা শিবসিংহ)

তাকে 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' বলা হয় ।

বিদ্যাপতি পদ রচনা করেছেন ব্রজবুলি ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির কাব্যকে বলেছেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'।

ব্রজবুলি ভাষা

বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশই রচিত হয়েছে 'ব্রজবুলি' নামে এক কৃত্রিম মিশ্র ভাষায়

মূলত মৈথিলি ও বাংলা মিশ্রিত এই মধুর সাহিত্যিক ভাষায় রচিত পদাবলী।

ব্রজবুলি কখনও মুখের ভাষা ছিল না; সাহিত্যকর্ম ব্যতীত অন্যত্র এর ব্যবহারও নেই।

এই কবিভাষা পদাবলীতে ব্যবহৃত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ।

মৈথিলি ও বাংলার সংমিশ্রণে এতে ধ্বনিঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

P2A

চন্ডীদাস

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর **আদি রচয়িতা চন্ডীদাস**

বাংলা ভাষায় তিনি বৈষ্ণব পদাবলির **আদি কবি ও শ্রেষ্ঠ কবি।**

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকের কবি।

তিনি **দুঃখের কবি,** সত্যর কবি, বিরহের শ্রেষ্ঠ কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্ডীদাসের কবিতাকে **'রুদ্রাক্ষমালা'** বলেছেন।

জ্ঞানদাস

তিনি মূলত চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন। **তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায় পদ্য রচনা** করলেও তাঁর **বাংলায় রচিত পদ্যগুলো পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে**। তিনি রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় অতৃপ্ত প্রণয় মিলনে ব্যকুলতা, মিলন পরবর্তী উচ্ছ্বাসধর্মী কবিতায় সিদ্ধহস্ত।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।

P2A

গোবিন্দ দাস

বিদ্যাপতির পদের অনুরণনই লক্ষ করা যায় বলে গোবিন্দদাস কে **'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'** বলা হয়। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতে পদ্য রচনা করলেও **ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি অধিক জনপ্রিয়তা লাভ** করেছে।

“নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নন্দিত অঙ্গ

জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্দুর ভঙ্গ।”

P2A

যশোরাজ খান

A.বাংলাদেশে সুলতান হোসেন শাহের আমলে প্রথম ব্রজবুলি পদ রচনা করেন যশোরাজ খান।

A.যশোরাজ খান উনার কবি উপাধি। মূল নাম দামোদর সেন।

বৈষ্ণব পদাবলির রচয়িতা

বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা বিদ্যাপতি

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা চন্ডীদাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

P2A

বৈষ্ণব পদাবলি

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ– বৈষ্ণব পদাবলী।
- এ অমর কবিতাবলী সৃষ্টি হয় – রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা– চণ্ডীদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলীর চতুষ্টয় – বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস।
- ব্রজবুলি ভাষা হলো – একটি কৃত্রিম ভাষা।
- রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা প্রভাবিত।

P2A

জীবনী সাহিত্য

- বাংলা সহিত্যে একটি পঙক্তি না যার নামে একটি যুতের সুষ্টি হয়েছে – শ্রীচৈতন্যদেব।
- বাংলা সাহেত্যে চৈতন্যযুগ বলা হয় – ১৫০১-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে।
- বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনী সাহিত্য – চৈতন্য জীবনী কাব্য।
- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে বলা হয় – কড়চা।
- শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী কাব্য – বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্যভগবত'।
- বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ – চৈতন্য মঙ্গল।
- বাংলাভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা ও তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী – কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

চৈতন্যদেবের উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থ

- শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম – মুরারিগুপ্ত
- শ্রীচৈতন্যভগবত – বৃন্দাবন দাস
- চৈতন্য মঙ্গল – লোচন দাস
- চৈতন্যচরিতামৃত – কৃষ্ণদাস কবিরাজ

P2A

অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা হয় **কৃত্তিবাস ওঝার** রামায়ন অনুবাদের মধ্য দিয়ে।

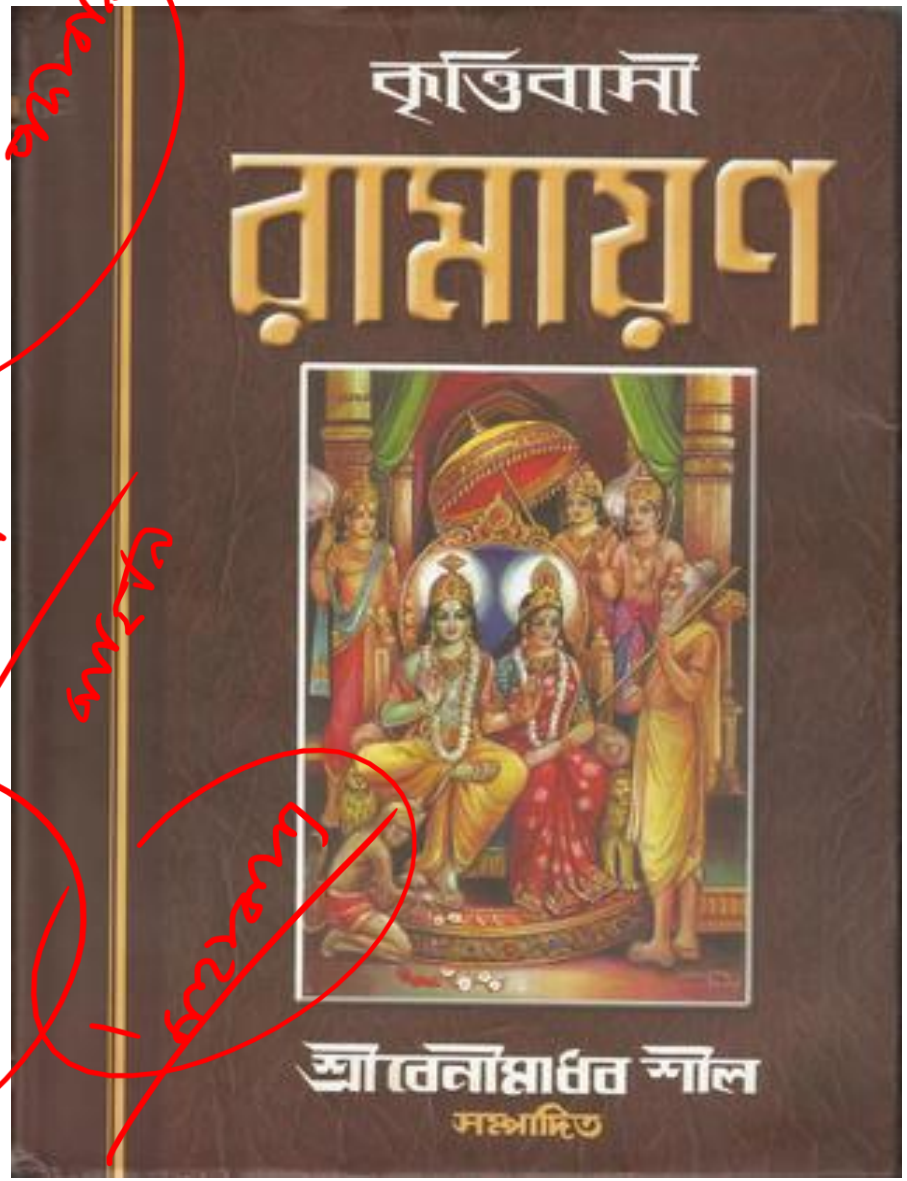

P2A

রামায়ণ

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ।

বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা। এটি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত হয়।

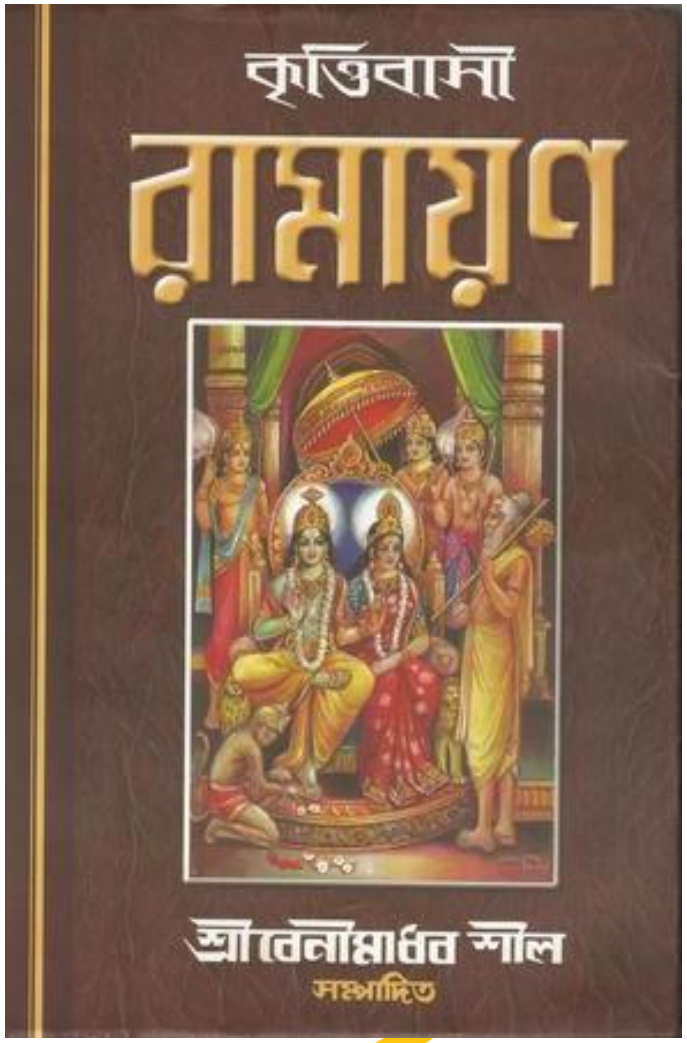

রামায়ন

রামায়নের প্রথম অনুবাদক পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালি **কবি কৃত্তিবাস ওঝা।**

আনুমানিক ১৪১৮ সালের দিকে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেন যা **কৃত্তিবাসী রামায়ণ** বা **'শ্রীরাম পাঁচালী'** নামে পরিচিত।

চন্দ্রাবতী

সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ন অনুবাদ করেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।

মনসামঙ্গলের কবি **দ্বিজ বংশীদাসের** মেয়ে।

P2A

মহাভারত

সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য মহাভারত।

মহাভারতের মূল উপজীব্য হল- কৌরব ও পাণ্ডবের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাবলি।

রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি বেদের ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে তাঁর অপর নাম বেদব্যাস।

মহাভারতের প্রথম অনুবাদক

ষোল শতকের কবি **কবীন্দ্র পরমেশ্বর** মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক।

তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন **সুলতান হুসেন শাহের** সেনাপতি চট্টগ্রামের **পরাগল খান**। পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম **'পরাগলী মহাভারত'**।

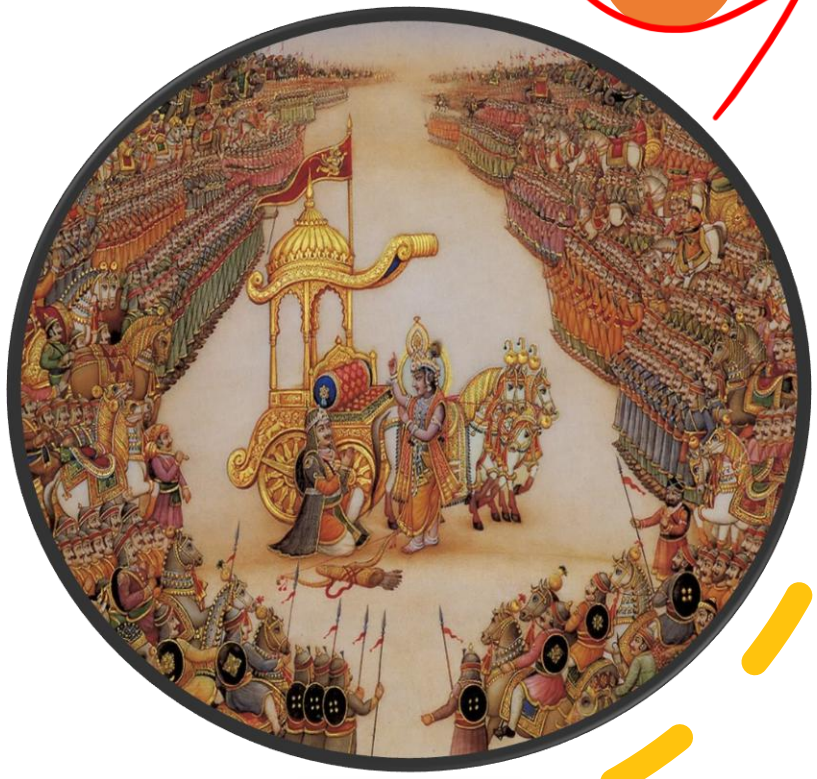

শ্রীকর নন্দী ও ছুটিখানী মহাভারত

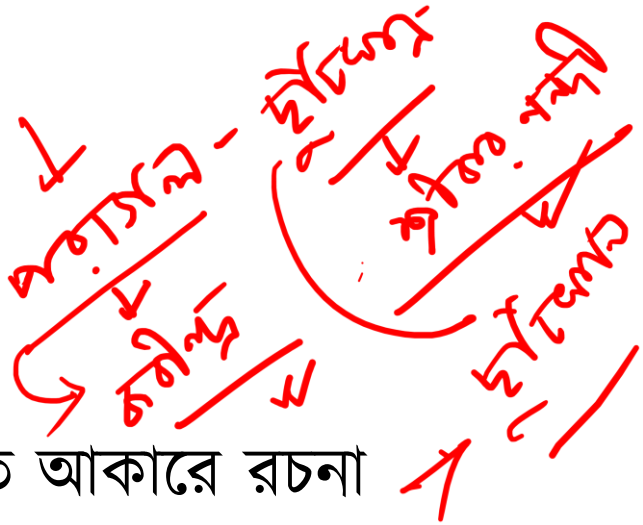

ছুটিখানী মহাভারত শ্রীকর নন্দী রচিত বাংলা মহাভারত।

শ্রীকর মূলত ছুটিখানের নির্দেশে সংস্কৃত মহাভারতের অশ্বমেধপর্বটি বিস্তৃত আকারে রচনা করেন। তাই সাধারণভাবে এটি **ছুটিখানী মহাভারত** নামে পরিচিত।

সংস্কৃত মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে যুদ্ধ, যুদ্ধের কলাকৌশল ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চট্টগ্রামের তৎকালীন শাসনকর্তা ছুটিখান এ অশ্বমেধপর্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে **শ্রীকর নন্দীকে** বাংলা ভাষায় বিস্তৃত আকারে অশ্বমেধপর্ব রচনা করার নির্দেশ দেন। কবি সে নির্দেশ অনুযায়ী শুধু অশ্বমেধপর্বই রচনা করেন।

P2A

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক

কাশিরাম দাস মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় অনুবাদক।

তার কাব্য রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। তিনি মহাভারত অনুবাদ সম্পন করতে পারেননি।

তার মৃত্যুর পর তার ভাইয়ের ছেলে ও অন্যান্যরা অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন।

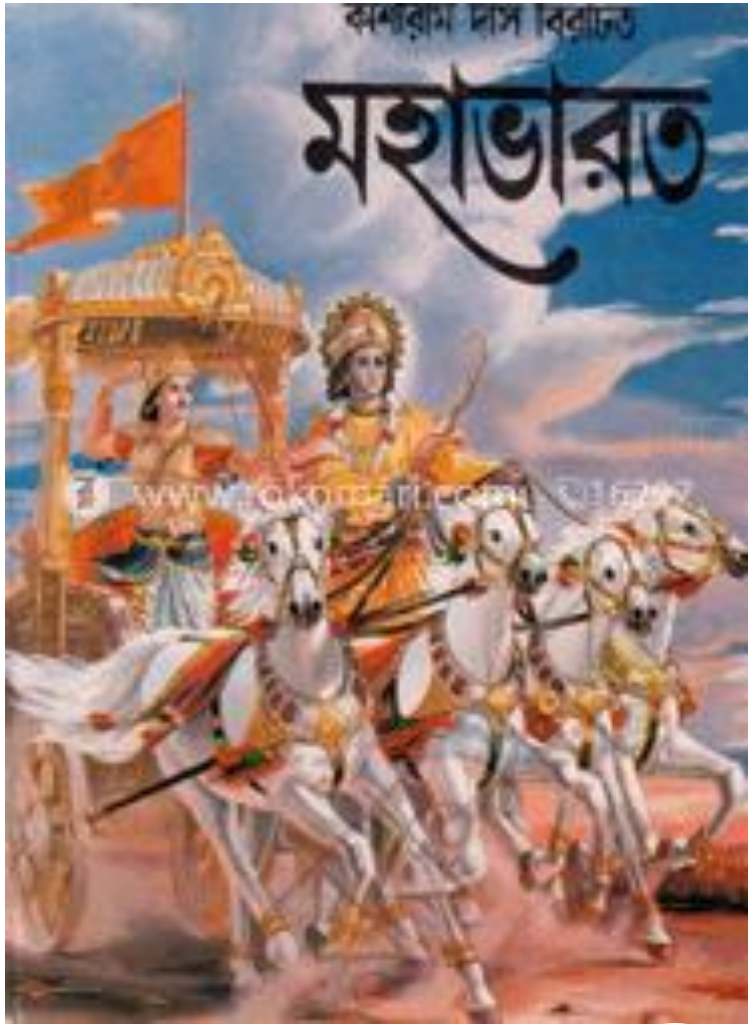

P2A

ভাগবত

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক ধরনের কাহিনি কেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ পুরাণ নামে পরিচিত।

আঠারটি পুরাণের অন্যতম হচ্ছে ভাগবত পুরাণ।

মালাধর বসু ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। মালাধর বসু অনুদিত ভগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

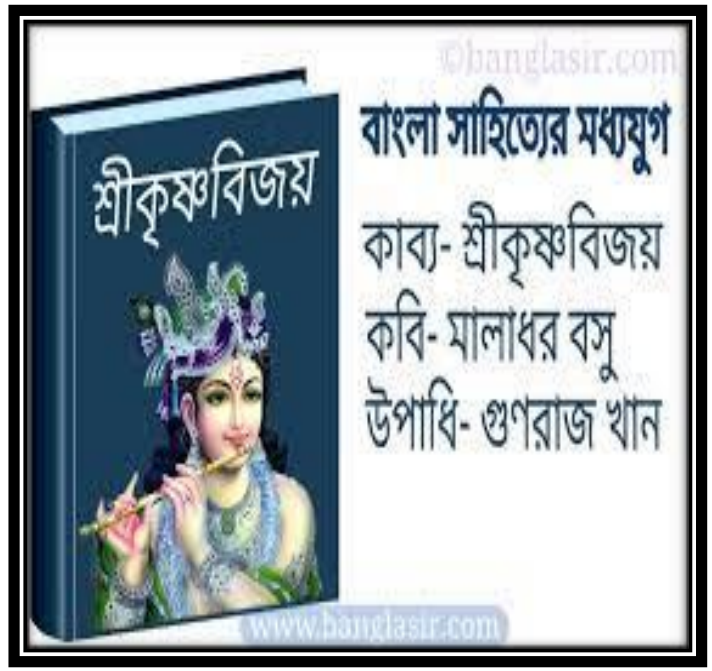

তাঁর লেখা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ। এটি ১২ খণ্ডে রচিত। এজন্য তিনি বাদশাহ **রুকনউদ্দিন বারবক শাহের** কাছ থেকে **'গুণরাজ খান'** উপাধি লাভ করেন।

P2A

একনজরে মহাভারত

মহাভারত রচিত হয় – সংস্কৃত ভাষায়

মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন – কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম **'পরাগলী মহাভারত'**।

মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক – কাশীরাম দাস।

ছুটিখানী মহাভারত শ্রীকর নন্দী রচিত বাংলা মহাভারত। অশ্বমেধপর্বটি বিস্তৃত আকারে রচনা করেন।
ভগবত বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন – মালাধর বসু।

মালাধর বসুর উপাধি – গুনরাজ খান।

মালাধর বসু অনুদিত ভগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

P2A